নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৫, পৃ:১৫-৩২
©২০০০ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্মাণ

রাশেদা আখতার*
জোবাইদা নাসরিন**

ভূমিকা

মানব জীবনে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ। স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষন লিঙ্গীয় পরিচয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকছে, সমাজের আধিপত্যশীল পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ যেখানে গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী অবস্থায় পুষ্টি তথা নারীর নারীর স্বাস্থ্যের নির্মাণ ঘটে এ মতাদর্শ অনুযায়ী। সমাজে লিঙ্গীয় সম্পর্কের যে অসমরূপ বিদ্যমান তা আরও স্পষ্ট হয় নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য কেন্দ্রিক খাদ্যাভ্যাস চর্চা, পুষ্টি ও নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞার সামাজিকীকরনের মধ্যদিয়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লক্ষ্যনীয়, ঘণ ঘণ গর্ভবতী হওয়া নারীর ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে না, সন্তানের জন্ম থেকে শুরু করে বুকের দুধ খাওয়ানো সহ সন্তানের সামগ্রিক দায়িত্ব পালন নারীকেই করতে হয়। ফলে তার শক্তি এবং শ্রমের ব্যয় হয় বেশি এবং নারীর শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু এটিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হয় এবং শ্রম শক্তির উৎপাদক হিসেবে নারীর স্বাস্থ্য চর্চা পরিবার বা সমাজের কাছে প্রায়শঃই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে না।

নারীর গর্ভাবস্থা ও দুগ্ধবতী অবস্থায় তার খাদ্য গ্রহণ, খাদ্য সংক্রান্ত আচরণ, তার চলাফেরা, পোশাক পরিচ্ছেদ সমস্ত কিছু সামাজিকভাবে নির্ধারিত থাকে। সংস্কৃতি ভেদে, ধর্ম ভেদে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে এই নির্ধারণ বা নির্মাণ প্রক্রিয়ার রূপ ভিন্ন ভিন্ন হয়।

এই প্রবন্ধ প্রবন্ধকারদের সাম্প্রতিক গবেষণার একটি অংশ। এ গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছিল সাভারের নবীনগরের পলাশবাড়ী ও কাইচাবাড়ী গ্রামে। প্রবন্ধে যদিও গর্ভবতী ও দুগ্ধবতীকে ঘিরে সামাজিক বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞাকে আলোকপাত করা হয়েছে (খাদ্য গ্রহণ, চলাফেরা, বিধি নিষেধ, পূর্ণিমা, অমাবস্যা সংক্রান্ত বিধি নিষেধ প্রভৃতি), কিন্তু এর সঙ্গে স্বল্প পরিসরে আলোচিত হয়েছে নারীর বয়ঃসন্ধিকাল, বিয়ে ও গর্ভধারনের বয়স, পুষ্টির সাংস্কৃতিকরণ ও খাদ্যাভাস চর্চায় গৃহস্থালীর রাজনীতি, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং তার স্বাস্থ্য কেন্দ্রীক ভাবনা। কারণ, এ সবই নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত।

গবেষণার যৌক্তিকতা

প্রজনন কেন্দ্রিক নারীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও খাদ্যাভাস চর্চা সম্পর্কিত বিষয়ের উপর লেখালেখি হলেও নৃবৈজ্ঞানিক লেখালেখি একেবারেই কম। এক্ষেত্রে, পূর্ববর্তী গবেষকদের কাজ কিছুটা আলোচনার দাবী রাখে। নারীর অবদান গৃহস্থালীতে

* শিক্ষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
** গবেষক, বাংলা একাডেমী

অকল্পনীয়, যেমন, গৃহস্থালী কাজ হিসেবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, রান্না বান্নার কাজ, সন্তান ধারণ ও লালন পালন এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য সদস্যদের দেখাশুনা করা। গৃহস্থালীতে নারীর এ ধরনের ভূমিকার ফলে তারা স্বাস্থ্য চর্চা ও পুষ্টির ক্ষেত্রে অসমতার সম্মুখীন হয় (নাগ ১৯৯১)। ১৯৯৩ সালে গুডক্রন এর একটি গবেষণায় তিনি দেখান যে, গর্ভবতী নারী মাছ ও দুধ খাওয়া এড়িয়ে যান। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন, কিভাবে নির্দিষ্ট কিছু খাবার নির্দিষ্ট কিছু অবস্থায় সরাসরি স্বাস্থ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আনারস খেলে গর্ভপাত হয়, হাঁসের ডিম খেলে সন্তানের শ্বাসকষ্ট হয়। জেটলীন ও রওশন (১৯৯৩) তাদের গবেষণায় দেখান যে, দুগ্ধবতী মায়ের জন্যে মাছ উপকারী। কিন্তু নারীরা মাছকে এড়িয়ে চলে। কারণ মাছের সাথে ভূত বা বাতাস থাকে।

গর্ভাবস্থা ও দুগ্ধবতী অবস্থায় নারীর স্বাস্থ্য নির্মানের ক্ষেত্রে সামাজিক মতাদর্শের ক্রিয়াশীলতা এতদিন প্রশ্নাতীত থেকেছে। নারী যেহেতু পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত তাই তাকে দেখা হয়েছে 'প্রকৃতি'র সঙ্গে তুলনা করে। আর পুরুষ যেহেতু সৃষ্টিশীল কাজ করে তাই তাকে দেখা হয়েছে 'সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করে (কলিয়ার এবং ইয়ানাগিসাকো ১৯৮৭; মুর ১৯৮৮)। প্রত্যেকটি সমাজে নারী ও পুরুষের এই ধরনের প্রতিকী সাংস্কৃতিক নির্মানের ক্রিয়াশীলতা নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাচ্ছে।[১] অর্থাৎ সামাজিক সংগঠন গুলোর সঙ্গে স্বাস্থ্যের এক জটিল মিথস্ক্রিয়া তৈরী হয় যেখানে বিজ্ঞান, চিকিৎসা পদ্ধতির চেয়েও গুরুত্ব পাচ্ছে সামাজিক প্রপঞ্চ সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ যা সমাজের লিঙ্গীয় অসম রূপকেই পুণরুৎপাদন করছে।

গবেষণা জিজ্ঞাসা

১. গর্ভাবস্থা ও দুগ্ধবস্থা নিয়ে নারীর অনুধাবন বিশ্লেষণ ।
২. গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী নারীর পুষ্টিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা।
৩. ভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী নারীর খাদ্যাভ্যাস ও চর্চা।
৪. গর্ভবতী ও দুগ্ধবতীর ক্ষেত্রে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি।
৫. গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী নারীর স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব।

গবেষণা পদ্ধতি

সাভার থানার ধানসোনা ইউনিয়নের পলাশবাড়ী ও কাইচাবাড়ী গ্রামের পঞ্চাশ জন গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী উত্তরদাতার মধ্যে এ গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। গ্রামে প্রবেশ করা এবং গ্রাম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নেয়ার জন্য দুই জন তথ্য প্রদানকারীও নির্বাচন করা হয়। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে গবেষিত জনগোষ্ঠীর উপর প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে জরীপ করা হয়। উত্তরদাতাদের নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের থেকে তথ্য সংগৃহিত হয়। সর্বশেষে কয়েকজনের বিশেষ ইতিহাস (case history) নেয়া হয়েছে যাতে উত্তরদাতা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ভাবে তথ্য নেয়া সম্ভব হয়।[২] গবেষণার বিষয়বস্তুর কারণে উত্তরদাতারা সকলেই ছিলেন বিবাহিত নারী। এক্ষেত্রে প্রথমতঃ প্রথমবার গর্ভবতী হয়েছেন এমন নারী; দ্বিতীয়তঃ

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চমবার গর্ভবতী হয়েছে এমন নারী; তৃতীয়তঃ গবেষণায় উত্তরদাতা হিসেবে এসেছেন গর্ভাবস্থা পার হওয়ার পর সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন এমন নারী; চতুর্থতঃ গর্ভবতী নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যকে ঘিরে পুরুষের মতাদর্শিক ক্রিয়াশীলতা দেখার জন্য কয়েকজন স্বামীর স্বাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। এ গবেষণায় 'গৃহস্থালী' বলতে বুঝানো হয়েছে যে সকল সদস্য একই চুলায় খায় এবং রাতে একই বাড়ীতে অবস্থান করে।[৩]

উত্তরদাতাদের সাধারণ তথ্যাবলী

উত্তরদাতাদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র, গ্রামে দরিদ্র লোকজনের সংখ্যাই বেশী, বেশীর ভাগ লোকেরই মাসিক আয় তিনহাজার টাকার নীচে। একটি গৃহস্থালীর মাসিক আয় হিসেব করা যায়নি। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র। অন্যের বাড়ীতে কাজ করে এতে মাসিক কোন বেতন নেই। কাজ করলে কেউ ধান, কেউ আটা, ভাত-তরকারী ইত্যাদি দিয়ে থাকে। দশ হাজার টাকা মাসিক আয় রয়েছে একটি গৃহস্থালীর, যার ধরণ হচ্ছে যৌথ। তাছাড়া পনের হাজার টাক আয় আছে তিনটি গৃহাস্থালীর। এর মধ্যে দুইজনের মুদি দোকান রয়েছে। একজন জমির দালালী করে ও কৃষি জমি রয়েছে। গৃহাস্থালীর অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে গৃহস্থালী প্রধানের পেশাকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে বেশীরভাগেরই (চুয়াল্লিশ জন) পেশা হচ্ছে গৃহিনী। বাকীরা গৃহকর্মের সাথে, মানে অন্যান্য পেশায়, যুক্ত। যেমন, কেউ গার্মেন্টস-এ চাকুরী করে, কেউ সেলাই করে, কেউ দাই এর কাজ করে, কেউ হাঁস মুরগী লালন পালন করে এবং একজন অন্যের বাড়ীতে কাজ করে। গৃহস্থালী প্রধানদের মধ্যে চাকুরীজীবী সতের জনের ক্ষেত্রে গণস্বাস্থ্য, পল্লীবিদ্যুৎ, ই, পি, জেড এবং গার্মেন্টসে এ চাকুরী করে । নয়জন কৃষিকাজ করে। পাঁচ জন বিদেশে থাকে এরা মালয়েশিয়া, সৌদী আরব, ইন্দোনেশিয়া, ও দুবাইতে থাকেন। ব্যবসায়ীদের মধ্যে মুদি দোকানের ব্যবসা, ভিডিও দোকান এবং শরবত বিক্রীর ব্যবসায়ী রয়েছেন। দিনমজুর হিসেবে কাজ করে যারা তারা কেউ ইট ভাঙ্গে, কেউ ভ্যানগাড়ী টানে, কেউবা রিক্সা চালায়, এদের মধ্যে কারো কারো প্রধান পেশার সঙ্গে অপ্রধান পেশা রয়েছে। অপ্রধান পেশা হিসেবে রয়েছে মাছের চাষ, কৃষি জমি বর্গা করা, বিদ্যুতের কাজ এবং ডিশের লাইনের ব্যাখ্যা

শিক্ষাগত যোগ্যতায় দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ উত্তরদাতা নিরক্ষর, চতুর্থ শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে এমন উত্তরদাতা হচ্ছেন দশ জন। নবম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পড়েছে এমন উত্তরদাতার সংখ্যা হচ্ছে সাত জন। কোন উত্তরদাতাই মেট্রিক পাশ করেননি। স্বামীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, বেশ বড় অংশ নিরক্ষর (সতের জন)। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে এমন উত্তরদাতা হচ্ছেন নয় জন। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে এমন উত্তরদাতার সংখ্যা হচ্ছে দশ জন। দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছে আটজন। এইচ.এস.সি. পর্যন্ত পড়ালেখা করেছে চারজন, কেউ পাশ করে নি।

গবেষিত গ্রাম দু'টিতে দেখা যায় যে, 'একক পরিবারের' সংখ্যা বেশি।[৪] এর কারণ হিসেবে জানা যায় যে, দরিদ্র গৃহস্থালীর অর্থনৈতিক মেরুকরণ' একক পরিবার তৈরীর ক্ষেত্রে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করছে। দরিদ্র গৃহস্থালীতে একদিকে যেমন পিতা

তার স্ত্রী, ছেলে মেয়ে, ছেলের বউ, নাতি, নাতনী নিয়ে থাকা অর্থনৈতিক কারনে সম্ভব হয় না তেমনি অন্যদিকে ছেলের ক্ষেত্রে বাবা-মা, ভাইবোন এবং নিজের গৃহস্থালীর ভরণ পোষণ করানো সম্ভব হয়না। আবার ধনী গৃহস্থালীতে দেখা যায় এর ব্যতিক্রম চিত্র। সেখানে যৌথ পরিবারের কাঠামো দেখা যায়। গবেষিত উত্তরদাতাদের উনচল্লিশ জন উত্তরদাতা 'একক পরিবারে' বসবাস করে এবং এগারজন উত্তরদাতা 'যৌথ পরিবারের' বসবাস করে। উত্তর দাতারা অনেকেই পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি ধর্মীয় মতাদর্শের কারণে, কেউ আবার স্বামী নিষেধ করার কারনে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি। তবে অনেকেই 'পরিবার' ছোট রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ হিসেবে বড়ি খেয়ে থাকে। গবেষিত এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা অফিসের কর্মীদের যাতায়ত রয়েছে। গণস্বাস্থ্যের চিকিৎসা তারা অনেকেই গ্রহণ করেন, এবং গবেষিত গ্রামে ওটাকেই হাসপাতাল বা জাফরুল্লাহ মেডিকেল বলা হয়। এগুলোর পাশাপাশি ধর্মীয় বিশ্বাস কেন্দ্রিক তাবিজ, পানি পড়া, ঝাড়ফুঁক, ঘরবন্ধ করা এ ধরনের চিকিৎসা এবং গাছের শিকড় কেন্দ্রিক লোকজ চিকিৎসাও প্রচলিত। ধনী গৃহস্থালীর ক্ষেত্রে দেখা যায় জটিল কোন রোগ হলে সাভার থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে থাকে। তবে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র কাছে হওয়াতে তারা সেখানেই বেশী গিয়ে থাকে।

বয়ঃসন্ধিকাল, বিয়ে ও গর্ভধারনের বয়স

এ গবেষণায় যদিও নারীর গর্ভাবস্থা ও দুগ্ধবতী অবস্থা বিষয়কে গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি গবেষণায় বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষনে নারীর বয়ঃসন্ধিকাল ও বিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গবেষণা এলাকায় দেখা গিয়েছে, উত্তর দাতা নারীদের ক্ষেত্রে তের থেকে পনের বছরের মধ্যে এবং বাকী অর্ধেকের বিয়ে হয় দশ থেকে বার বছরের মধ্যে। গবেষণা এলাকার দরিদ্র উত্তরদাতাদের একজনের কাছে 'বিয়ে মানে ঘর অর্থাৎ আশ্রয় পাওয়া।' আর স্বচ্ছল উত্তর দাতাদের একজনের ভাষ্য মতে, 'বিয়ে মানে ঘর পাওয়া, বর পাওয়া, সন্তান পাওয়া।' অর্থাৎ এক ধরনের পুনরুৎপাদন ব্যবস্থাপনা। কিছু উত্তরদাতার বিয়ের পর রজঃস্রাব হয়েছে। নারীর বয়ঃসন্ধিকাল এবং রজঃস্রাবকে ঘিরেও নারীর স্বাস্থ্যের সামাজিকীকরণ ঘটে। বিয়ের পরে এবং আগে হওয়া রজঃস্রাব কেন্দ্রিক সামাজিক অভিজ্ঞতায় পার্থক্য দেখা যায়। আবার ধর্ম ও সংস্কৃতি ভেদেও নির্মাণ প্রক্রিয়া ভিন্ন। বিয়ের আগে রজঃস্রাবের সময় পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে বেশি মেলামেশার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ধর্মীয় গ্রন্থ ছোঁয়া কিংবা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আদান-প্রদান নিষিদ্ধ থাকে। কারণ, এসময় সে 'নাপাক' আছে বলে মনে করা হয়। বিয়ের পরের রঙঃস্রাব নারীর 'লজ্জা' এবং অস্বস্তিকে বাড়িয়ে তোলে। উত্তর দাতাদের একজনের ভাষ্য মতে, 'সে এ সময় শাশুড়ী ও স্বামীর কাছে আসতে লজ্জা পেত, পরে শ্বাশুড়ী তাকে বুঝিয়ে দিলো এবং ভেন্না গাছের নীচে যেন রজঃস্রাবে ব্যবহৃত কাপড় না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে বললো।' কেননা তাতে তার ভবিষ্যতে মরা সন্তান হবে। এ সময় শ্বাশুড়ী তাকে স্বামীরসঙ্গ এড়িয়ে চলা এবং চুলার কাছে যেতে নিষেধ করলো। গবেষিত একটি মাত্র হিন্দু গৃহস্থালীতে উত্তরদাতাকে রজঃস্রাবের পর একটি অন্ধকার ঘরে দুই তিন দিন কাটাতে হয়েছে। সে ঘরে অন্যদের যাওয়া নিষেধ ছিল। তারপর তাকে গ্রামের বাড়ীতে নেয়া হয় এবং ঠাকুর দিয়ে মন্ত্র পড়ানো হয় তাকে নতুন জামা দেয়া হয়।

অর্থাৎ সে নারী জীবনের পূর্ণতা পেয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। এভাবে রজঃস্রাব কেন্দ্রিক অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকাল হতে নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ভাবনা সামাজিকভাবে তৈরী হতে থাকে। দশ-পনের বছরের মধ্যে নারীর বিয়ের কারণ হিসেবে যে ধারণাটি কাজ করে তা হলো, 'চেহারা ভালো থাকতে থাকতে মেয়েদের বিয়ে দিতে হয়। বিশ বছরের পর মেয়েদের চেহারা খারাপ হয়ে যায়, তখন আর ভালো বিয়ের প্রস্তাব আসে না।' এক্ষেত্রে বিয়ের বাজারে নারীর 'চেহারা' গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার যে সামাজিক মতাদর্শ ক্রিয়াশীল- এক্ষেত্রে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। এছাড়া দরিদ্র গৃহস্থালীতে অর্থনৈতিক কারনে মেয়েদের একটা পর্যায়ের পর স্কুলে গিয়ে পড়ার চেয়ে ঘরকন্নার কাজকে গুরুত্ব দেয়া হয়। ধরে নেওয়া হয় এতে সে পরবর্তীতে 'ভাল বউ' হতে পারবে। স্বচ্ছল গৃহস্থালীতে কখনও কখনও বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত মেয়েদের পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষা বিয়ের ক্ষেত্রে মর্যাদার প্রতীক হয়ে উঠেছে। এ ছাড়াও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে বিয়ে সম্পর্কযুক্ত। হিন্দু সাংস্কৃতিতে যৌতুককে 'উপহার' হিসেবে দেখা হয় এবং সে সংস্কৃতি অনুযায়ী কন্যাদান মানে সতীত্বের উপহার। বাংলাদেশের সকল স্থানেই যৌতুক মানে কনে পক্ষের অনিচ্ছাকৃত দান যা বরপক্ষের চাহিদা (demand) মোতাবেক হয়। উচ্চবিত্ত পরিবারে মেয়েকে 'উপহার' দেয়া মেয়ের জন্য বাড়তি মর্যাদার যোগান দেয় বটে, কিন্তু দরিদ্রের জন্য যৌতুকের বাধ্যবাধকতা তৈরী হয় (হোয়াইট ১৯৯২ :১০২)। অবশ্য হিন্দু, মুসলিম সম্প্রদায়ে এই যৌতুকের রূপ এবং পরিমানে ভিন্নতা দেখা দেয় (শর্মা ১৯৯৪ :৩৪০)

গবেষণা এলাকার নারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাদের বেশির ভাগই প্রথম সন্তানের মা হয়েছে তের থেকে বিশ বছরের মধ্যে। এক্ষেত্রে সন্তান জন্মদান এবং গর্ভধারণ বিষয়ে তাদের বেশির ভাগেরই কোন মতামত নেই এবং ছিলোনা। বিয়ের পরে নারীর বাচ্চা হবে এটাকেই তারা স্বাভাবিক চিন্তা হিসেবে ধরে নেয়।

গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী নারীর পুষ্টিজ্ঞান ও খাদ্যভাস চর্চা

গবেষণা এলাকার একজন উত্তরদাতা নারীর কাছে পুষ্টি মানে, যে সকল খাদ্য খেলে মা ও বাচ্চার গায়ে লাগবে ও তাড়াতাড়ি ফল পাবে তাই হলো পুষ্টিকর খাবার। অর্থাৎ পুষ্টির ধারণা তার কাছে 'শরীরে লাগে' বোধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। নারীর পুষ্টিজ্ঞান এবং পুষ্টির মতাদর্শের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে অর্থনৈতিক অবস্থান। একজন উত্তর দাতা বলেন, 'আমরা গরীব মানুষ, বাছ বিচার, পুষ্টি অপুষ্টি বুঝিনা, স্বামী যা আনে তাই খাই। অনেক খাবার থাকলেই না, স্বাদ বুজে খাওয়া যায়।' স্বচ্ছল গৃহস্থালীর উত্তরদাতারা পুষ্টিজ্ঞান বিবেচনা করে শাক, (লাল, কচু, পুই, লাউ, ঢেঁকি, পালং) ফলমূল, (আম, আপেল, লিচু, পেঁপে, কাঁঠাল) মাছ, (শিং, মাগুর, কাতল, রুই) দুধ, সবজি, (পটল, কাঁচাকলা, মিষ্টি কুমড়া) মাংস, (মুরগী, কলিজা, ডিম) খায়। পুষ্টি জ্ঞানের উৎস হিসেবে স্বচ্ছল গৃহস্থালীতে রেডিও, টিভি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দরিদ্র গৃহস্থালীতে পরিবার পরিকল্পনা কিংবা স্বাস্থ্য কর্মীদের যাতায়াত এবং তাদের স্বামীর কথার মূল্যায়ন বেশি হয়। কারণ, এদের সাথে বাইরের জগতের সঙ্গে বেশি যোগাযোগ, তাই তারা বেশি জানে । এছাড়া, যেসব নারীরা গবেষণা এলাকার বাইরে বিভিন্ন অফিসে কাজ করে তাদের কথা গুরুত্ব পায়। অর্থাৎ স্বচ্ছল কিংবা দরিদ্র উভয় অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটেই

বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ' জানার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। খাদ্য গ্রহণ ও খাদ্যাভ্যাস সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৃহস্থালীর রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

গৃহস্থালীর রাজনীতি

গৃহস্থালী সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। গর্ভাবস্থায়, দুগ্ধবতী অবস্থায় নারীর স্বাস্থ্যকে দেখতে হলে একে গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করতে হলে, দেখতে হবে গৃহস্থালীকে, গৃহস্থালীর রাজনীতিকে, অর্থাৎ নারী যেখানে বাস করে সেটিকে গবেষণা এলাকায় দেখা গিয়েছে যে, গৃহস্থালীই নারীর শ্বশুরবাড়ী, গৃহস্থালীতে বসবাসরত সদস্যদের ভূমিকা, খাদ্য বন্টন ও খাদ্য নির্বাচন এবং একটি শিশুর আগমন উপলক্ষ্যে গৃহস্থালীর আয়োজন, ভাবনা, চিন্তা প্রভৃতি বিশ্লেষনের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসবে গৃহস্থালীর রাজনীতির অপ্রকাশিত দিক।

গৃহস্থালীর রাজনীতি অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, যেসব গৃহস্থালীতে ভাসুর এবং দেবর ও তাদের বউরা থাকে গর্ভবতীর প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা নির্ভর করে গৃহস্থালীতে রোজগারের কতটুকু দিয়েছে তার উপর। একজন স্বচ্ছল গৃহস্থালীর উত্তর দাতা জানিয়েছেন যে, 'যেহেতু তার ভাসুরের রোজগার বেশি, গৃহস্থালীতে তিনি টাকা দেন বেশি তাই বড় জায়ের কর্তৃত্ব বেশি। তার গর্ভাবস্থায় বড় জা-ই খাবার দাবার সহ সকল কিছুই নিয়ন্ত্রন করতো। এক্ষেত্রে শাশুড়ী থাকলেও তিনি ছিলেন খুবই নগন্য ভূমিকায়।' অর্থাৎ এক্ষেত্রে যেটি ঘটেছে তা হলো গৃহস্থালীতে যে বেশি টাকা দেয় তার কর্তৃত্ব দাপট থাকে এবং সেটি পুরুষ থেকে নারীতে হচ্ছে। আবার অন্যদিকে সমমর্যাদার সকল নারীর মধ্যে এই নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব নিয়ে প্রতিযোগীতা চলছে। গবেষণা এলাকার আরেকজন উত্তরদাতা জানালেন, 'তার শাশুড়ী আগে দাই এর কাজ করেছেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থতার জন্য কোন কিছু করতে পারছেননা। কিন্তু তিনি বারবার বউ-কে বলছেন শুয়ে থাকলে কি হবে, এ সংসার আমার।' উত্তর দাতার গর্ভাবস্থায় তিনিই তার প্রধান উপদেশক এর দায়িত্ব পালন করছেন। কারণ হিসেবে বলেছেন, সবাই তাকে গুরুত্ব দেয়, আর তার নাতি হবে, সেই সবকিছু দেখা শুনা করছে।

এক্ষেত্রে প্রথমত তার নাতি কামনা সামনে চলে এসেছে, অন্যদিকে তার অসুস্থ্যতায় সংসারের কর্তৃত্ব বউ এর হাতে চলে যায় কিনা এটি নিয়ে তিনি এক ধরনের মানসিক চাপ অনুভব করছেন। যার ফলে কর্তৃত্বের প্রশ্নে বৌ শাশুড়ী মুখোমুখি হচ্ছেন, অনেক উত্তরদাতা শ্বাশুড়ীর সামনে স্বাচ্ছন্দ্যে উত্তর দেননি। শাশুড়ী চলে গেলে স্বাচ্ছন্দ্যে বলেছেন।

গৃহস্থালীর খাবার বন্টন

গবেষণা এলাকার বেশির ভাগ গৃহস্থালীর মধ্যে দেখা গিয়েছে যে, 'যৌথ পরিবার' এবং 'একক পরিবার' যাই হউক না কেন নারীরা পরে খাচ্ছে। 'যৌথ পরিবারে' শ্বাশুড়ী বউকে খাবার দেয় 'একক পরিবারে' যদিও এর নিয়ন্ত্রন বউ এর উপর থাকছে, কিন্তু সে পরে খাচ্ছে অর্থাৎ 'পরিবারে'র অন্য সবার

খাওয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকছে তাই নারীদের ভাগ্যে জোটে । তাছাড়া বাজারে এবং বিভিন্ন কেনা কাটায় যায় পুরুষ তাই পুরুষের পছন্দমতই খাবার দাবারই নারীকে খেতে হচ্ছে। কখনও কখনও স্বামীরা হয়তো জিজ্ঞেস করছে কি খেতে মন চায়' কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষ যা বাজার করে নিয়ে আসে নারীকে তাই রান্না করতে হয়। খাবার বন্টনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সব সময় যেরকম থাকতো সেরকমই রয়েছে। অর্থাৎ একজন নারী নিজের শরীরের মধ্যে আরেকজন মানুষকে বহন করছে এবং সে ক্ষেত্রে তার যে শক্তি ক্ষয় হচ্ছে বিষয়টির দিকে কারও লক্ষ্য নেই। কারণ, নারী মা হবে এটিতো স্বাভাবিক। দুই একটি ক্ষেত্রে যদিও নারীকে বার বার এবং বেশি খাবার গ্রহণের তাগিদ দিচ্ছে তার ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ সময়েই গর্ভবতী নারীর স্বাস্থ্যের চেয়ে যে আসছে তার স্বাস্থ্য গুরুত্ব পায় বেশি।

'যৌথ পরিবারে (এগারটি) গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী নারীদের খাবার নির্বাচন শ্বাশুড়ী কিংবা বড় জা করে দিচ্ছেন। অর্থাৎ যার হাতে 'পরিবারের' নিয়ন্ত্রন থাকছে তিনি খাদ্য নির্বাচন করছেন। তবে বিষয়ের ক্ষেত্রে যে সব বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পাচ্ছে সেগুলো হলো -

- গৃহস্থালীর অর্থনৈতিক অবস্থা
- পুষ্টিগুণ বিবেচনা
- ভিটামিন সম্পর্কে ধারণা
- দুর্বলতা কাটানো/সবলতা পাওয়ার ধারণা
- স্বাদ
- শরীরের মঙ্গল জ্ঞান

এ সময় সুস্থ সন্তান গর্ভধারণ থেকে শুরু করে প্রসব সহ দুগ্ধকালীন সময় পর্যন্ত একজন নারীকে যতটুকু দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়, একজন পুরুষকে তা করতে হচ্ছেনা। সন্তানের খাওয়া দাওয়ার খবর নেয়া ছাড়া এসময় পুরুষ কোন দায়িত্ব পালন করেনা। কারণ, তাদের কাছে সন্তান জন্ম থেকে শুরু করে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো সব কিছু মেয়েদের কাজ, এবং মেয়েলী বিষয়। তারা (পুরুষরা) আরও বলেন যে, সন্তান ও নিজ সম্পর্কে যদি কোন সমস্যা হয় তখন শ্বাশুড়ী এবং/অথবা মায়ের সাথে আলাপ করাই যথেষ্ঠ। গবেষণা এলাকার একজন দরিদ্র নারী বলেছেন, ''বাচ্চা হওয়ার পর তিনি খুবই দুর্বল হয়ে যান, তার স্বামীকে তিনি বার বার অনুরোধ করেছেন তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। তার স্বামী উত্তর দিয়েছে 'খাইতে পারলে আবার ডাক্তার কিসের ? দুবেলাতো ভাত খাস , অসুস্থ্য হইলে কি মানুষ খাইতে পারে। মাইয়া লোকের প্রাণ বড় শক্ত, সহজে মরেনা'। গর্ভবতী থাকা অবস্থায় কয়েকজন নারীকে স্বামী ভিটামিন ঔষধ এনে দিয়েছে। এর কারণ, তারা শুনেছে গর্ভাবস্থায় বাচ্চার ভিটামিনের অভাব থাকলে বাচ্চা ভালো হয়না। অর্থাৎ গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী অবস্থায় নারীর পুষ্টিজ্ঞান তৈরী ও খাদ্যাভাস চর্চা হচ্ছে এক প্রশ্ন বিহীন প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে। পুরুষ যেহেতু অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত তাই তাকে ভালো খেতে হয়। নারীর গৃহস্থালীর কাজ কোন ভাবেই

কাজ হিসেবে বিবেচিত নয়। কারণ এর কোন বিনিময় মূল্য নেই। তাই অনেক নারীই পেট ভর্তি করে খাবার খায়না। এমনকি স্বচ্ছল গৃহস্থালীর একজন উত্তরদাতা বলেছেন, 'শাশুড়ী বলেছে বেশি খেতেনা, কারণ বাচ্চা বড় হবে এবং প্রসবে কষ্ট হয়।'

গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী অবস্থায় সামাজিক বিধিনিষেধ

নারীর মাতৃত্ব শুধুমাত্র জৈবিক বিষয়ই নয় এটি একটি সামাজিক প্রপঞ্চও বটে । তাই শারীরিকভাবে দেখলেই হয়না, এটাকে দেখতে হবে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে। নারীর গর্ভাবস্থা এবং দুগ্ধবতী সময়ের সাথে যুক্ত হচ্ছে সমাজের নানা ধরনের মূল্যবোধ, নিয়মকানুন, সামাজিক মতাদর্শ যা মূলতঃ সমাজের বিদ্যমান পিতৃপ্রধান মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত।

গর্ভাবস্থায় গর্ভবতী নারীকে বেশ কিছু সামাজিক বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়। কারো কারো কাছে এর নির্দিষ্ট কোন যুক্তি নেই। তবে মানুষ তা পরিবার, সমাজ থেকে জেনে মেনে থাকে। আবার এক এক সাংস্কৃতিক এলাকার বিধি নিষেধ এক এক রকম। গবেষিত এলাকার নারীরা বিভিন্ন জনের দেয়া নিষেধাজ্ঞা যেমনঃ ফকির, মা, শাশুড়ী, বাড়ীর মুরব্বী, স্বামী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের থেকেই মেনে থাকে । সন্তান পেটে আসার পর গর্ভবতী নারী যে সকল বিধি নিষেধ মেনে থাকে তা নিম্নে দেখানো হলো।

বিভিন্ন ধরনের সাধারণ বিধিনিষেধ

- ❑ ভারী কাজ (চাপকলে পানি তোলা, ধানের পালিত উঠা-নামা করা, লাকড়ি ভাঙ্গা) না করা।
- ❑ চুল, আঁচল খোলা রেখে কোথায় না যাওয়া।
- ❑ বেলা ডুবার আগে (সন্ধ্যার আগে) ঘরে ফেরা
- ❑ পেটিকোটের ফিতা উপরে বাধা, মাথায় ঘোমটা দেয়া।
- ❑ শ্মশানে, আঁতুর ঘরে না যাওয়া।
- ❑ ম্যাচ, লোহা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া।
- ❑ কবরস্থানে না যাওয়া। পা ছড়ায়ে না বসা।
- ❑ আনারস সহ বিশেষ বিশেষ খাদ্য না খাওয়া
- ❑ মরা মানুষ দেখতে না যাওয়া
- ❑ মসজিদের কাছ দিয়ে না হাঁটা।

গর্ভবতী নারীর খাবারের ক্ষেত্রে সামাজিক নিষেধাজ্ঞা

গবেষিত এলাকার গর্ভবতী নারীরা গর্ভাবস্থায় খাদ্যের ক্ষেত্রে কিছু নিষেধাজ্ঞা মেনে চলে । এসব নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে মাছ, মাংস, ফলমূল ইত্যাদি। খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়ম-কানুন তারা সমাজ থেকেই নিজের মত করে আত্মস্থ করে নেয়।

বিরত থাকা খাদ্য	বিরত থাকার কারণ
মৃগাল মাছ	সন্তানের মৃগী রোগ হয়।
বাইং মাছ	সন্তানের চেহারা বাইং মাছের মত দেখায়, বাচ্চা বেশী দুষ্টামি করে, বাচ্চা হতে কষ্ট হয়।
বোয়াল মাছ	সন্তানের মুখের হা বড় হয়।
গজা, চিংড়ী ও শিং মাছ	সন্তানের ক্ষতি হয়।
ইলিশ মাছ	বাচ্চার গায়ে ফোসকা পড়ে।
হাঁসের ডিম, হাঁসের মাংস	বাচ্চার অমঙ্গল হয়, শ্বাস কষ্ট রোগ হয়, কর্কশ গলা হয়।
মশুর ও অন্যান্য ডাল	সন্তান বিকলাঙ্গ হবে।
কচু শাক (কম খেয়েছে)	বেশী খেলে বাচ্চা ঝগড়াটে হয়।
আনারস	বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়
ক্ষিরা, বাঙি	সন্তানের শরীর ফাটে
ভাদ্র মাসে তাল	সন্তানের গায়ে গন্ধ হয়
শুটকী মাছ	পেটে গোলমাল (গ্যাস হয়)

অনেকে আবার ভাত কম খেয়েছে, পুষ্টিকর খাবার কম খেয়েছে - কারণ, 'বাচ্চা এতে বেশী বড় হয়ে যাবে। আর বেশী বড় হলে সন্তান হওয়ার সময় কষ্ট বেশী হয়।' বেশীর ভাগ মা'ই সন্তানের বেড়ে উঠা নিয়ে চিন্তায় থাকে। এইজন্য বাড়ীর মুরব্বী, শাশুড়ী, মা যা বলে তাই তারা মানে। তাদের মতে, এসব নিয়ে ঝুকি নেয়া যায় না। কয়েকজন বলেন - 'মা যদি খুব বেশী খায় তবে পরবর্তীতে বাচ্চাও বেশী খেতে চায়।' এতে ছেলে সন্তান হলে অসুবিধা হয়না কিন্তু মেয়ে সন্তান হলে অসুবিধা। এরা বড় হলে পরের বাড়ী চলে যাবে, কেমন ঘরে বিয়ে হবে তার তো কোন ঠিক নেই। আর তাছাড়া ছেলেদের শক্ত কাজ করতে হয় মেয়েদের তুলনায়। ছেলেদের বেশী খেলে দোষ নেই। এই মূল্যবোধের কারনে মা সন্তান পেটে থাকা অবস্থায়ই তা নিয়ন্ত্রন করে। অর্থাৎ এখানে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মতাদর্শই ফুটে উঠে। কারো কারো ক্ষেত্রে সরাসরি বিধি নিষেধ মানার চাপ আসে আর কারো ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ সরাসরি নয়, শুনে নিজের থেকে মানা হয়, সন্তানের মঙ্গলের জন্য।

সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নারীরা কিছু খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। বেশীর ভাগ নারীরাই মাছ যেমন, মৃগাল, বাইং, বোয়াল, ইলিশ, গজার, চিংড়ী ও শিং মাছ খায়না । কারণ, মৃগাল থেকে মৃগী রোগ, ইলিশ খেলে গায়ে গন্ধ ইত্যাদি নানারকম নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের মতে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ হিসেবে তারা এগুলো চর্চা করে, গ্রহণ করে কিন্তু যুক্তির ক্ষেত্রে এগুলোর কোন ব্যাখ্যা তাদের কাছে নেই। কেউ আনারস খায়না কারণ বাচ্চা নষ্ট হবে সেই ভয়ে। হাঁসের মাংস খায় না এতে সন্তানের শ্বাসকস্ট হয় এবং সন্তানের কর্কশ গলা হয়। ক্ষিরা , বাঙি খায় না সন্তানের গায়ের চামড়া ফাটবে। তাদের এ সকল বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, খাদ্য সন্তানের শরীর, চরিত্র ইত্যাদি নিয়ন্ত্রন করে এবং একই সঙ্গে

এই সকল বিধিনিষেধ নারীর স্বাস্থ্যকে নির্মাণ করছে। যেমনঃ তাদের মধ্যে কেউ কেউ ডিমের কুসুম খায়না বাচ্চার অমঙ্গল ভেবে।

আবার কিছু খাদ্য আছে যা গর্ভবতী নারী খাওয়া খেতে বিরত থাকে, কারণ, এতে মা'র সমস্যা হয়। যেমনঃ আনারস খায় না সন্তান নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে। এছাড়া ঝাল তরকারী শুটকী এগুলো খায়না গ্যাস হওয়ার ভয়ে। তবে অল্পস্বল্প টক খেয়ে থাকে মুখের রুচীর জন্য। মিষ্টি জাতীয় খাবার অনেকে খেতে পারেনি। কিন্তু বিধিনিষেধ ছিলোনা। এছাড়া গর্ভবতী নারীরা কখনও জোড়া কলা খায়না - কারণ, ধারণা করা হয় এতে জমজ বাচ্চা হতে পারে। কারণ, নারীরা বিশ্বাস করে সে গর্ভবতী অবস্থায় যে খাদ্য গ্রহণ করবে, তার প্রভাব পড়বে তার বাচ্চার উপর। সর্বোপরি নারীর ধারণা মা'র স্বাস্থ্য ভালো থাকলে সন্তানের শরীরও ভাল থাকবে।

দুগ্ধবতী নারী

নারীরা গর্ভাবস্থায় যেমন খাদ্যের ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধ মানে তেমনি সন্তান জন্ম গ্রহণের পর দুগ্ধবতী নারীও বেশ কিছু নিয়ম কানুন মেনে থাকে। তবে বেশীর ভাগ নারীরা সাধারণতঃ চল্লিশ দিন এবং তার বেশী সময় নিয়ম মেনে থাকে। খাদ্যে নিষেধাজ্ঞা মূলতঃ একটি সামাজিক নির্মাণ।

দুগ্ধবতী নারীর খাদ্যে নিষেধাজ্ঞা

১. মাছ ঃ ইলিশ, চিংড়ী মাছ, বোয়াল মাছ, মৃগাল মাছ, শুটকী মাছ
২. মাংস ঃ গরুর মাংস, হাঁসের মাংস, খাসীর মাংস।
৩. শাকসব্জী ঃ বেগুন, মিষ্টি কুমড়া, সীম, যে কোন ধরনের শাক।
৪. ডিমঃ হাঁসের ডিম।
৫. ফলমূলঃ আনারস, কমলা।
৬. ডালঃ খেসারী, মুগ, মাসকলাই।
৭. অন্যান্য ঃ ঠান্ডা জিনিস (পানি, আইসক্রীম), টক (তেঁতুল, টক বরই), ঝাল (মরিচ), পঁচাবাসী খাবার।
(উৎস ঃ প্রাগুপ্ত)

উপরে বর্ণিত খাদ্যগুলো দুগ্ধবতী নারীরা খাওয়া থেকে বিরত থাকেন। কেউ চল্লিশ দিন এই নিয়ম মানে, কেউ এক বছর অর্থাৎ বার মাস এবং কেউ আঠার মাস পর্যন্ত খাদ্যের কিছু কিছু বিষয় মেনে থাকে। যদিও নারীরা সঠিকভাবে জানেনা, কেন তারা খাদ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়ম-কানুন মানে। তবে তাদের বক্তব্য হচ্ছে - 'এগুলো খেলে সন্তানের ক্ষতি হয় তাই মানে।' গর্ভাবস্থায় যে সকল খাদ্য থেকে নারী বিরত থাকে সন্তানকে দুধ খাওয়া অবস্থায়ও প্রায় কয়েকটি খাদ্য ছাড়া একই খাদ্য থেকে বিরত থাকে। নারীরা সাধারণতঃ টক, ঝাল জাতীয় খাদ্য থেকে বিরত থাকে। কারণ, এগুলো সন্তানের পেট খারাপ করে। তাছাড়া মায়ের ধারণা মায়ের

খাদ্যের সাথে শিশুর স্বাস্থ্যের একটা সম্পর্ক রয়েছে। তাই সন্তান যতদিন বুকের দুধ খায়- বিশেষ করে প্রথম চল্লিশ দিন খাদ্যের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বেশী মেনে থাকে। গবেষিত এলাকার নারীরা কিছু খাদ্যকে 'গরম' খাবার হিসেবে চিহ্নিত করে যা খেলে সন্তানের হজমের সমস্যা হয়। যেমন - ইলিশ, হাঁসের ডিম, হাঁসের মাংস, শুটকী। সাংস্কৃতিক ভভাবে 'গরম খব্যার' মানে হচ্ছে শক্তি (**energy**) সম্পন্ন খাদ্য। এ সকল খাবার সন্তানের জন্য খারাপ। তাই একজন দুগ্ধবতী মা সাংস্কৃতিকভাবে এ সকল খাদ্য থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে।[৫]

যেহেতু নারীরা নিজেরাই ''ভাল খাবার'' এবং 'খারাপ খাবার' এর ধারণায় আবদ্ধ তাই তারা নিজেরাই কখনও প্রশ্ন করে না কেন খারাপ ? কেন ভালো ? চিংড়ী মাছকে তারা খারাপ খাবার বলছে - কারণ, এতে সন্তানের শরীরে চুলকানি হতে পারে। সীম বেগুনকে তারা খারাপ খাবার বলছে কারণ, এগুলো খেলে সন্তানের হজমের সমস্যা হয়। বিভিন্ন ধরনের শাক, খেসারী ডাল এ সকল খাদ্য থেকে অনেক নারী বিরত থাকে কারণ, তাদের ধারণা এগুলো খেলে সন্তানের পাতলা পায়খানা হতে পারে। অর্থাৎ এখানে একজন মা সব সময় চিন্তা করে স্বাস্থ্যগতভাবে তার সন্তান ভালো থাকবে, তার সন্তানের যাতে কোন অমঙ্গল না হয়। আর মা সেই দৃষ্টিকোন থেকে চেষ্টা করে খাদ্যের বিষয়ে নিয়ম-কানুন মেনে চলতে। কয়েকজন নারী তেমন নিয়ম-কানুন মানেনি। কারণ, তাদের মতে, 'দুবেলা খাবার যোগাড় করতে তারা হিমসিম খায়। কি খেলে সন্তানের ভালো হবে আর কি খাবে না তা চিন্তা করার সুযোগ নেই।'

পোশাক-পরিচ্ছদে সামাজিক নিষেধাজ্ঞা

একজন গর্ভবতী নারী তার গর্ভাবস্থায় ব্যবহৃত কাপড় চোপড়ের ক্ষেত্রেও সামাজিক বিধি নিষেধ পালন করে থাকে যা তাদের সাথে আলাপের মধ্য দিয়ে বের হয়ে আসে। গবেষিত এলাকার বেশীর ভাগ নারীই (পঁয়ত্রিশ জন) পোশাকের বিধিনিষেধ মেনে থাকে। তবে সন্তান জন্ম গ্রহণ করার পর তাদের নিজেদের পোশাকে আর তেমন নিষেধাজ্ঞা দেখেন না। তখন সন্তানের পোশাকের ক্ষেত্রে তাদের নিয়ম-কানুন কাজ করে। যেমন ঃ বেশী রঙ্গীন কাপড় না পড়া, কারণ মানুষের নজর লাগবে, জ্বীন ও ভূতে ধরতে পারে। আবার, অনেক উত্তরদাতা আছেন যারা পোশাকের বিধি নিষেধ মানেননা। যেমন ঃ একজন উত্তরদাতা বলেন, পরনের কাপড় উপরে টাইট করে শাশুড়ী পরতে বলেছেন - কিন্তু তিনি পরেননি। কাপড় টাইট করে পরার কারণ হচ্ছে, সন্তান পেটের উপরের দিকে উঠতে পারবেনা। সন্তান স্বাভাবিকভাবে জন্মগ্রহণ করবে এবং মার প্রসব কষ্ট কম হবে। আরকেজন উত্তরদাতা বলেন - 'গরীব মানুষের আবার বিধি-নিষেধ কি? যা পাই তাই পরি।'

পোশাক-পরিচ্ছেদের যে সকল বিধি-নিষেধ গবেষিত এলাকায় ক্রিয়াশীল সেগুলো হলো ঃ বেশী চকচকে শাড়ী না পরা , যেমন ঃ লাল, বেগুনী, কমলা, হলুদ শাড়ী না পরা, ছাপার শাড়ী না পরা। কারণ , রঙ্গীন কাপড়ের সাথে আলগা

বাতাস ধরার ভয় থাকে। এমনকি তাদের অনেকের ধারণা রঙ্গীন চকচকে শাড়ীতে গর্ভবতীর উপর ভূতের নজর লাগতে পারে। এতে গর্ভের সন্তানের অমঙ্গল হতে পারে, সন্তান নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং সন্তানের নানা ধরনের সমস্যা হতে পারে। একজন উত্তরদাতার মতে, 'গর্ভাবস্থায় সব কাজের ফাঁকে যে বিষয় বেশী খেয়াল রাখতে হয় তা হলো- শাড়ীর আঁচল যেন মাটিতে না পড়ে। কারণ, এতে সন্তানের অমঙ্গল হয়।'

চলাফেরার ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুন

গর্ভবতী নারীর চলাফেরার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা ক্রিয়াশীল। এক্ষেত্রে চলাফেরায় প্রায় সবাই নিয়ম মেনে চলেছে। দূরে কোথায়ও কখনও যায়নি। কারণ, এতে শরীর খারাপ হতে পারে বলে সবার বিশ্বাস। তাদের চলাফেরায় নিয়ম-কানুন মানার সাধারণ কারণ হলো পেটের সন্তানের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে গবেষিত নারীর কেউই এর ব্যতিক্রম কিছু করেনি। খারাপ কিছু হবে ভেবে। একজন নারীর বক্তব্য হচ্ছে 'প্রথম সন্তানের সময় কোন নিয়ম-কানুনই মানি নাই। শ্বাশুড়ীও বলেছে সব করতে কিন্তু সন্তানটা নষ্ট হয়ে গেছে। দ্বিতীয় সন্তানের সময় এখন সব মেনে চলছি।'

গর্ভবতী নারীরা চলাফেরার ক্ষেত্রে যে সকল বিধি-নিষেধ মেনে চলে সেগুলো হলো: দুপুর ও সন্ধ্যায় কোথায়ও না যাওয়া, আঁচল গুঁজে রাখা, কবরের পাশ দিয়ে না হাঁটা, মরা মানুষ দেখতে না যাওয়া, শশ্মানের কাছ দিয়ে না যাওয়া, আঁতুর ঘরে না যাওয়া, চুল খোলা রেখে কোথায় না যাওয়া এবং মসজিদের পাশ দিয়ে না যাওয়া । এগুলো তারা মেনেছে কেউ নিজ থেকে, কেউ আবার শ্বাশুড়ী, মা, মুরব্বী, স্বামী, ফকির ও আশেপাশের মানুষ থেকে নির্দেশ পেয়ে। তবে এদের মধ্যে বর্তমানে যারা দুগ্ধবতী মা তারা এখন আর চলাফেরায় তেমন কোন নিয়ম মানে না। শুধু নিজেদের কাজের সুবিধা-অসুবিধা ও সন্তানের বয়স ও স্বাস্থ্যের কথা ভেবে তারা চলাফেরা করে । সন্তান বেশী ছোট থাকলে চলাফেরায় সীমাবদ্ধতা থাকে। যেমন ঃ সন্তানের বয়স চল্লিশ দিন না হওয়া পর্যন্ত তার উপরের নিষেধাজ্ঞা গুলো মেনে থাকে। যা তার সম্পূর্ণভাবে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটেই করে থাকে ।

সূর্যগ্রহণ , চন্দ্রগ্রহণ ও অমাবস্যা

গর্ভবতী থাকা অবস্থায় উত্তরদাতা চার জন ব্যতীত সকল নারী সূর্যগ্রহণ , চন্দ্রগ্রহণ ও অমাবস্যা মেনে চলেন। অর্থাৎ এ সকল সামাজিক নিয়ম-নীতি গর্ভবতীর উপর প্রভাব ফেলে বলে তারা বিশ্বাস করেন। যে কয়জন উত্তরদাতা এসকল না মানার কথা বলেন - তারা 'গ্রহণ' হয়েছে কিনা জানতো না। তাই নিজেরা না মানার কথা বলে। একজন উত্তরদাতা এসকল সময়কে ''অস্বাভাবিক সময়'' বলে আখ্যায়িত করেন। একজন উত্তরদাতা বলেন 'চন্দ্রগ্রহণ আমি জানতামনা, শুয়ে ছিলাম, অনেক কাটাকাটিও করেছি কিন্তু আমার বাচ্চার কোন ক্ষতি হয়নি।' গবেষিত এলাকার নারীরা বিশ্বাস করেন যে, 'অস্বাভাবিক সময়কে'

না মানলে বাচ্চার ক্ষতি হয়, বাচ্চার ঠোঁট কাটা হয়। বাচ্চার হাত-পা ছোট হয়। এমন কি, বাচ্চার মৃত্যুও ঘটতে পারে। তারা আরও বিশ্বাস করে যে, চন্দ্রগ্রহণের দিন সেলাই করলে, ছিদ্র ভরাট করলে, হাঁটাহাঁটি না করলে, শুয়ে থাকলে , হাঁস-মুরগী কাটলে, সাপ, পোকামাকড়, ব্যাঙ মারলে, সন্তান পঙ্গু কিংবা বিকলাঙ্গ হয়ে থাকে। অর্থাৎ অন্য জীবনকে কষ্ট দিলে সন্তান কষ্ট পায়। এসকল কাজ থেকে শুধু তারাই বিরত থাকে না, তাদের স্বামীদেরও এসব কাজ করা সামাজিক ভাবে নিষিদ্ধ।

এসময় যাতে সন্তানের ও গর্ভবতী নিজের কোন সমস্যা না হয় সে জন্য নারী হাঁটা-হাঁটি করে, খালি পেটে থাকে। হাঁটাহাঁটি বেশীক্ষণ করলে যদি অসুস্থবোধ করে তাহলে গর্ভবতী নারী নিজের সমান লম্বা বাঁশ মাপ দিয়ে সেই বাঁশকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে রাখে কিংবা পুকুরে ফেলে দেয়। আবার, অনেকে সুই'কে সোজা করে কলাগাছে গেঁথে রেখেছেন। তারা মনে করেন যে, সোজা করে রাখলে সন্তানের চরিত্র সুদৃঢ় হয় এবং চন্দ্র, সূর্য গ্রহণের সুফল পাওয়া যায়। একজন উত্তরদাতা বলেন - 'আমার বাচ্চার কান একটু বাঁকা মনে হয়, আমার বিশ্বাস চন্দ্রগ্রহণের দিনে সেলাই করেছিলাম বলে এমন হয়েছে।'

সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো নিয়ে নিষেধাজ্ঞা

কোন মা তার সন্তান জন্ম গ্রহণ করার পর দুধ খাওয়াবে তাই নিয়ম। মায়ের দুধের সাথে সন্তানের স্বাস্থ্যও নির্ভর করে। কারণ, শিশুরা প্রথম অবস্থায় শুধু মায়ের দুধই খায়। কিন্তু এই দুধ খাওয়ানো নিয়েও আছে সামাজিক বিধি নিষেধ।

গবেষণা এলাকায় দেখা যায় সন্তান জন্মগ্রহণ করলে প্রথমে শাল দুধ নিয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। শালদুধ খারাপ দুধ, এতে বাচ্চার ক্ষতি হয় তবে এধরনের ধারণা শ্বাশুড়ী, মা কিংবা এ বয়সের নারীরা বলে থাকেন। যা আমরা ছোট বেলা থেকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিখে থাকি। কিন্তু বর্তমানে রেডিও, টেলিভিশন, স্বাস্থ্য কর্মীর কারনে এই শাল দুধের উপর নিষেধাজ্ঞা তেমন নেই।[৬] একজন উত্তরদাতার মতে, 'আমার শাশুড়ী আমাকে শাল দুধ খাওয়াতে নিষেধ করেছে কিন্তু আমি শুনি নাই সন্তানের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে।'

গবেষণা এলাকার নারীরা সব সময় সন্তানকে দুধ দিতে পারে না। সেক্ষেত্রেও নানারকম বিধিনিষেধ রয়েছে। গবেষিত বেশীর ভাগ নারী (ছত্রিশ জন) বিধি নিষেধ মেনে চলে। কয়েক জন (চার জন) কোন নিয়ম-কানুনই মানে না। আর যারা প্রথম গর্ভবতী তাদের বক্তব্য হচ্ছে - এখনও বাচ্চা হয়নি তাই জানিনা কি নিয়ম-কানুন পালন করতে হবে । তবে বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বলে। কারো সন্তান বিভিন্ন কারনে দুধ খায়না। সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে যে ধরনের বিধি - নিষেধ মানা হয় সেগুলো হলো:

- ❑ বাইর থেকে এসে হাত-পা ধুয়ে প্রথম দুধ ফেলে-তারপর আগুনে নিজের হাত সেঁকে দুধ খাওয়ান।

- আযানের সময় দুধ না খাওয়ানো।
- আগে ডান দুধ খাওয়ান, পরে বাম দুধ খাওয়ান।
- পায়ের ধুলা দিয়ে দুধ খাওয়ানো।
- চুল দিয়ে দুধ ঝেড়ে খাওয়ান।
- বাতাস উঠলে দুধ না খাওয়ানো।
- বাচ্চাকে কাজল দিয়ে দুধ খাওয়ানো।
- ভর দুপুরে দুধ না খাওয়ানো।
- সবার সামনে দুধ না খাওয়ানো।

জ্বীন ভূত এবং আলগা'র ধারণা: নারীর ভিন্ন মাত্রিক ব্যাখ্যা

গর্ভবতীকালীন সময়ে নারীরা যে কোন শারীরিক সমস্যায় (ডায়রিয়া সহ অন্যান্য) ডাক্তারী চিকিৎসা না নিয়ে এবং কবিরাজের নির্দেশ অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণের পরিবর্তে মা কিংবা বাচ্চার সমস্যাকে ভূত অথবা জ্বীনের (Evil spirit) ক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করে। গর্ভাবস্থায় যেকোন ধরনের অসুস্থ্যতার ক্ষেত্রে নারীরা শক্তিশালী ঔষধ (Medicine) গ্রহণ করেন না। তারা মনে করেন, এটি আলগার কাজ। তারা আরও মনে করেন ঔষধ খেলে গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।' (ব্লানচেট ১৯৮৪ , অং এ, ১৯৯৮৭)। জ্বীন ভূতের বিশ্বাস ও আলগা বাতাসে বিশ্বাস করে গবেষণা এলাকায় বেশীরভাগ নারীরা। চার জন নারী আলগা বাতাসের বিষয় বিশ্বাস করে না। তবে জ্বীন ভূত বিশ্বাস করে। আলগা বাতাস মানে তাদের মতে 'খারাপ বাতাস'। এসব বিশ্বাস করেন না এমন একজন উত্তরদাতার বক্তব্য হচ্ছে- 'প্রথম সন্তান মারা গেলে সবাই বলেছে ভূতে ধরেছে। তবে আমি তা মানি নাই। কারণ, তার নিউমোনিয়া হয়েছিল।' একজন অবস্থাপন্ন উত্তরদাতা বলেন - 'আমি এসব বিশ্বাস করিনা। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ীর কারনে মানতে হয়।' অর্থাৎ আমাদের সমাজব্যবস্থায় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নারী নিজে বিশ্বাস না করলেও শ্বশুর বাড়ীতে অনেক কিছু তাকে আত্মস্থ করতে হয়।

যারা 'আলগা বাতাস' লাগার বিষয় বিশ্বাস করেন, তাদের অনেকেরই ধারণা আলগা লাগার ফলে সন্তান মারা যায়, সন্তান বুকের দুধ খায়না। এমনকি অনেকের ধারণা আলগা লাগার ফলে অনেক নারীর বাচ্চা হয়নি। একজন উত্তরদাতার সাত মাসের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। তার ধারণা এ সময় সে মাঠে বকরীর বাচ্চা হওয়া (রুবিয়া) দেখতে গিয়েছিল। আর তখনই তার আলগা লেগেছিল। আরেক জনের ধারণা, 'আলগা বাতাসের কারনে সে ফিট হয়ে যায়।'

গবেষিত নারীরা আলগার উৎস হিসেবে অনেকগুলো বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন ঃ

- শরীর খারাপের (ঋতুস্রাব) ব্যবহৃত কাপড় থেকে আলগা লাগতে পারে।
- হিন্দু মৃত ব্যক্তির সঙ্গে আলগা ভর করে তা থেকে আলগা লাগতে পারে।
- দুপুরের বাতাসে আলগা থাকে।
- কবরস্থান দিয়ে হাঁটলে আলগা লাগে।

- শশ্মান থেকে আলগা লাগে
- সন্ধ্যা বেলার বাতাসে আলগা থাকে।

একজন উত্তরদাতা ভূতে ধরার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন 'ভূতে ধরেছিলো বলে আমার প্রথম বাচ্চা মারা যায়।' আরেকজন উত্তরদাতা বললেন, 'পাশের বাড়ীতে হিন্দু মারা তিনি দেখতে যায়, তখন আলগা ধরে।'

এসব খারাপ বাতাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের কলাকৌশল গ্রহণ করেন। তবে অনেক নারীর বক্তব্য হলো তাদের অভিজ্ঞতা নেই, তবে মানেন। রক্ষা করার কৌশল হিসেব বিভিন্ন জিনিস ঘরে রাখা, চলাফেরায় নিয়ম মানা, ফকিরের কাইতান পড়া, রসুন, লোহা, ম্যাচের কাঠি, কোরবানীর গরুর হাড় রাখা, চামড়ার জুতা, ফকির দিয়ে পড়ায়ে ঘর বন্ধ রাখা, ঘরের দরজায় শাবল রাখা, ভেন্না গাছের শিকড় রাখা। তাদের ধারণা এগুলো রাখলে ঘরে কোন ভাবে আলগা বাতাস ও জ্বীন ভূত ঢুকতে পারে না। আর কেউ কেউ বলেন, সব কাজই নিজেকে করতে হয় যার জন্য কোন নিয়মই মানতে পারি না, শুধু সাথে রসুন রাখি''।

এখানে একটি জিনিস উল্লেখযোগ্য যে, এই আলগা জ্বীন ভূত সবই গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী নারীকে ঘিরে তৈরী। গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী নারীদের স্বামীকে আলগা বা জ্বীন ভূতে ধরেছে এমন ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ নারীকে ঘিরে এসকল ধারণা এবং সন্তানের সকল খারাপ অবস্থার জন্য নারীকে দায়ী করার প্রবণতা গবেষণার এলাকায় লক্ষ্যনীয়-যা প্রাধানাশীল পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শের মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীল থাকছে। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো লক্ষ্যনীয় তাহলো, খুব বেশী দরিদ্র নারীরা তাদের জীবন সংগ্রামের বাস্তবতার কারনেই 'আলগা ধারণাকে' তেমন একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না বা চর্চা করছেন না। এটিকে এই গবেষণা 'নারীর প্রতিরোধ'[৭] হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে (স্কট, জে, ১৯৯০) দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ অনেক নারীই কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্বাস না করলেও শ্বশুর বাড়ীর কারনে মানতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে সমাজিক যে মতাদর্শ সমাজে প্রচলিত তাহলো নারী আদর্শবতী মা হিসেবে সন্তানের মঙ্গল অমঙ্গল দেখবে।[৮] সুতরাং 'আদর্শ মা' হওয়ার জন্য সমাজের কাছে নারী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী নারীর ক্ষেত্রে সন্তানের লিঙ্গীয় অবয়ব (ইমেজ)

গবেষণা এলাকাতে দেখা গিয়েছে প্রথম সন্তান হিসেবে গর্ভবতী নারীর পুত্র সন্তান কামনা করছে। (চেন, এল, সি এবং হু, ই, ডি, সুজা, এস ১৯৮১) তবে যার পূর্বে কয়েকটি সন্তান মারা গিয়েছে বা নষ্ট হয়েছে তাদের কাছে সন্তানের লিঙ্গীয় পরিচয়ের থেকে প্রাথমিক অবস্থায় সন্তানই মূখ্য। তবে সন্তান জন্মগ্রহণ করার পূর্বেই সমাজিক ভাবে ছেলে মেয়ের ব্যাপারে নিয়ম মানা হয়। নির্দিষ্ট কিছু কাজ করলে গর্ভের সন্তানটি মেয়ে হবে এবং এটি এড়িয়ে চললে ছেলে হবে এ ধরনের বোধ উত্তর দাতাদের মধ্যে রয়েছে। একজন উত্তর দাতা বলেন, 'মুরুব্বীরা বলে কাঁচা মরিচ বেশী খাইলে মেয়ে হইবো'। আরেক জন উত্তর দাতা বলেন যে,

'বেশী ভাত খেলে নাকি মেয়ে হয় আর বেশী ঝাল খেলে ছেলে। কারণ ছেলেদের গায়ে তেজ থাকবে'। সমাজের পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের কারনে আগত সন্তানের ক্ষেত্রে ছেলে সন্তানের কামনা থাকে বেশী, এছাড়া, ছেলে সন্তান বংশ রক্ষা করবে এবং পরবর্তী জীবনে বাবা-মার দেখাশুনা করবে, এ ধরনের বোধ ক্রিয়াশীল।

উপসংহার

এই প্রবন্ধে গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী অবস্থায় নারীর পুষ্টি তথা স্বাস্থ্যের নির্মান কিভাবে ঘটে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি- সমাজের লিঙ্গীয় সম্পর্কের অসমরূপ কিভাবে মতাদর্শের মধ্যদিয়ে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা তৈরী হয়। এ গবেষণায় দেখা যায় যে, নারী যখন গর্ভবতী থাকে এবং নারীরা যখন সন্তানকে বুকের দুধ দেয় তখন কিংবা স্বাভাবিক সময়ে নারীর খাদ্য পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ দিয়ে প্রভাবিত হয়। কারণ 'ভালো খাবারটা' সব সময় গৃহস্থালী প্রধান বা কর্তা কিংবা ছেলে সন্তানকে দেয়া হয়। গর্ভাবস্থায় নারীর খাদ্য গ্রহণ মূলতঃ গৃহস্থালীর মতাদর্শিক আধিপত্যের মধ্যদিয়েই ক্রিয়াশীল। কোন কারণে সন্তানকে বুকের দুধ দিতে সমস্যা হলে কিংবা সন্তান অসুস্থ হলে বা তার মৃত্যু হলে নারীকে দোযারোপ করা হয়। কারণ, সে সন্তানের যত্ন ভালোভাবে নেয়নি। গর্ভবর্তী ও দুগ্ধবতী নারীর মধ্যে খাদ্য, চলাফেরা, পোশাক পরিচ্ছেদ, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা কাজ করে। এর মধ্যে দিয়ে নারীর স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্মাণ ঘটে। শুধুমাত্র গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধাবস্থায়ই নয় বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই নারীর স্বাস্থ্য কেন্দ্রিক ভিন্ন পরিসর (separate sphere) তৈরী হয়, যা একজন পুরুষের ক্ষেত্রে কখনও ঘটে না। এ সকল বিধি নিষেধ নারী কখনও নিজের ইচ্ছায় মানে, কখনও গৃহস্থালী, পরিবার তথা সমাজের জন্য নারী মেনে চলে। বিধি নিষেধ মেনে চলার মধ্য দিয়ে সমাজের কাছে 'আদর্শ' স্ত্রী ও মা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। উত্তরদাতাদের মতে, এসকল নিয়ম কানুন সমাজের তৈরী। জ্বীন ভূত, আলগা এই নিষেধাজ্ঞা নারীকে ঘিরেই তৈরী হয় এবং নারীকেই মানতে হয়। শিক্ষা, অবস্থান এবং অর্থনৈতিক অবস্থা ভেদে নিয়মকানুনের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা দেয়। তাদের মতে, এসব না মানলে বাচ্চার ক্ষতি হয়। মা'র শরীর খারাপ হয়। ফলে সন্তান ও মায়ের মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা মূলতঃ সামাজিক নিয়মেই চলে যা আবার ব্যক্তিভেদে, গৃহস্থালী ভেদেও সমাজ ভেদে ভিন্ন হয়। তবে সামাজিক নিষেধাজ্ঞা সমূহকে নারী যুগপৎ ভাবে গৃহস্থালী ও সমাজের বৃহত্তর পরিসরে চ্যালেঞ্জ করে। নারী কোন ভাবেই সামাজিক নিষেধাজ্ঞার নিস্ক্রিয়কারক **(passive actor)** না বরং যেমনটা দেখা গিয়েছে গৃহস্থালীর রাজনীতির ক্ষেত্রে, নারী কর্তৃত্ব নিয়ে (এক্ষেত্রে শ্বাশুড়ী, জায়ের গৃহস্থালী রাজনীতি) প্রশ্ন তোলে। সেখানে নারী নিজের মতাদর্শ তৈরী করে অর্থাৎ নারী প্রেক্ষিত অনুযায়ী স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমাজে বিদ্যমান প্রভাবশালী মতাদর্শিক **(dominant ideology)** আচার-আচরণ বিশ্বাস, মূল্যবোধ ইত্যাদি গ্রহণ, বর্জন, কিংবা প্রতিরোধ করে।

টীকা

১. এই গবেষণাকর্মটি ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত নৃবিজ্ঞান প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত হয়েছিল (আখতার ২০০০)।

২. স্বল্প পরিসরে এই প্রবন্ধে কেইস দেয়া হয়নি। মূল গবেষণায় যুক্তিকে সমর্থন দিতে কেইস দেয়া হয়েছে (বিস্তারিত দেখুন, আখতার ২০০০)।

৩. গৃহস্থালী সম্পর্কিত নারীবাদী নৃবিজ্ঞানীদের ধারণাসমূহের জন্য বিস্তারিত দেখুন Harris 1994. Whitehead 1994.

৪. গবেষক জানে 'যৌথ পরিবার' ও 'একক পরিবার' এ প্রত্যয়গুলো সমস্যাজনক। গৃহস্থালীর মধ্যে পরিবার থাকতে পারে। গবেষক একক পরিবার বলতে বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে এক সঙ্গে থাকে তাকে বুঝিয়েছেন। আর 'যৌথ পরিবার' বলতে বাবা-মা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, ছেলের বউ/ভাইয়ের বউ একসঙ্গে থাকাকে বুঝিয়েছেন (বিস্তারিত দেখুন Standing 1991)।

৫. 'গরম-ঠান্ডা' এই রূপকসমূহ দক্ষিন এশিয়ার বিভিন্ন গবেষণা কর্মেও লক্ষ করা যায় (বিস্তারিত দেখুন Kurin 1983)।

৬. শালদুধ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে যা গবেষক তার গবেষণা প্রতিবেদনে বিস্তারিত দিয়েছেন (বিস্তারিত দেখুন, স্বাস্থ্যতথ্য ১৯৯৫)।

৭. 'প্রতিরোধ' ধারণা বিভিন্ন গবেষক বিভিন্নভাবে দেখান (যেমন, স্কট ১৯৯০)। এই গবেষণায় আলগা না মানার মধ্য দিয়ে নারী যে সামাজিক মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জ করছে, আলগার মাধ্যমে তাকেই প্রতিরোধ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

৮. সব সময়ই যে নারী প্রতিরোধ করছে তাও নয়, কখনও সে নিজের মত করে সেটির অনুবাদ করছে, কখনও যথোচিতভাবে ভাবে আত্মস্থ করছে।

গ্রন্থপঞ্জী

আখতার, রাশেদা (২০০০) গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী নারীর স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্মাণঃ পলাশ বাড়ী ও কাইচা বাড়ী বিশ্লেষণ, ফোর্ড ফাউন্ডেশন অনুদান প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত গবেষণাকর্মের অপ্রকাশিত প্রতিবেদন, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

স্বাস্থ্য তথ্য (১৯৯৫) তথ্য মন্ত্রনালয়/স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়/ইউনিসেফ ও ইউ.এন.এফ.পি.এ. প্রকাশিত বুলেটিন, ঢাকা।

Blanchet, Therese (1984) *Meanings and Ritual of Birth In Rural Bangladesh.* Dhaka: University Press Limited.

Collier, J. F and Yanagisako, S. J. (1987) *Gender and Kinship: Essays Toward a Unified Analysis.* Stanford University Press Stanford, California:

Chen, L. C., Huo, E., S. D' Souza (1981) Sex bias in the family allocation of food and health care in rural Bangladesh. In *Population and Development Review*, Vol. 1, No. 1, pp. 435-74.

Goodburn E (1993) Feeding During Illness in Bangladesh: A Study Based on a Review of Recent Literature, UNICEF.

Harris, Olivia (1994) Households as Natural Unit. *In Of Marriage and the Market*, ed. K. Young, A. Wolkowitz and R. McCullagh. London: Routledge.

Kurin. R. (1983) Indigenous Agronomy and Agricultural Development in Indus Basin. *Human Organization*, 42 (4)

Moore. Henrietta (1988) *Feminism and Anthropology*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Nag. Moni (1991) Sex Preferance in Bangladesh India and Pakistan and Its Effect on Fertility. Working Paper No. 27. Dhaka: The Population Council.

Ong. A. (1987), *Spirit of Resistance and Capitalist Discipline*. Albany: SUNY Press.

Sharma Ursula (1994) Dowry in North India: Its Consequences for Women. In *Family, Kinship and Marriage in India*, ed. P. Uberoi. Delhi: Oxford University Press.

Scott, J. (1990) Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven : Yale University Press

Standing. Hilary (1991) *Dependence and Autonomy: Women's Employment and the Family in Calcutta*. London: Routledge.

White. Sarah C (1991) *Arguing with the Crocodile*. Dhaka: University Press Limited

Whitehead. Ann (1994), 'I'm hungry, mum'. The Politics of Domestic Budgeting. In *Of Marriage and the Market*. ed. K. Young, C. Wolkoneitz, and R. McCullagh, London: Routledge.

Zeitlyn. S. and Rowshan, R. (1993) Ideas About Breast Feeding in Bangladesh. Unpublished Report, ICDDR,B Dhaka.